

WORLD SYSTEM THEORY

The roots of the World System Theory can be traced to the writings of Lenin. In his monumental work, *Imperialism—The Highest Stage of Capitalism*, Lenin contended that imperialism created a two-tier structure within the capitalist world economy. He identified the dominant structure as the 'core' and the less-developed structure as the 'periphery'. It is the location of the states within this capitalist world economy, which determines the patterns of interaction and relation of domination and dependence between them. Galtung (1971) and Wallerstein (1974) further developed this theory and provided powerful insights into the working of the world capitalist economy. Among other proponents of this theory, the noteworthy were Andre Gunder Frank (*Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, 1967), Raúl Prebisch* (1963), the first Executive Director of the United Nations Economic Commission for Latin America, John Gallagher and Ronald Robinson** (1953), and Gunnar Myrdal† (1957), the author of *Asian Drama*.

The main line of argument of the World System theorists is that the dependency situation of the developing countries is the direct result of the economic exploitation by the advanced countries. They define the situation of dependency, as a "situation in which a certain number of countries have their economy conditioned by the development and expansion of another..., placing

*Raúl Prebisch, *Towards a Dynamic Development Policy for Latin America*, United Nations, New York, 1963.

**John Gallagher and Ronald Robinson, 'The Imperialism of Free trade,' *Economic History Review*, Vol. 6, No. 1, 1953.

†Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, Gerald Duckworth, London, 1957.

the dependent countries in a backward position exploited by the dominant countries".

Dependency theorists not only reflect upon the external factors like foreign states, MNCs, international banks, multilateral lending institutions, foreign control of technology and an international bourgeoisie as causes of dependency but also highlight the internal constraints on development such as patterns of land tenure, social structures, class alliances, and the role of the state. These internal factors strengthen and reinforce the instruments of foreign domination. As a result of the interplay between these internal and external factors, the nature of development or underdevelopment of society will vary.

With this line of thinking in mind, some of the World System theorists use Marxist terminology and Leninist insights to explain this situation of dependency. Here the structural theories of dependency of the two chief proponents will be discussed.

Immanuel Wallerstein and His World System Theory

Wallerstein represents the most powerful exposition of the modern World System theory in his seminal work *Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (1974). Tracing the emergence of capitalism in the sixteenth century Europe, he examines its evolution into a world capitalist system that contains a **core**, a **periphery** and a **semi-periphery** (see Figure 2.1). The 'core' has come to constitute historically the most advanced economic areas, which are engaged

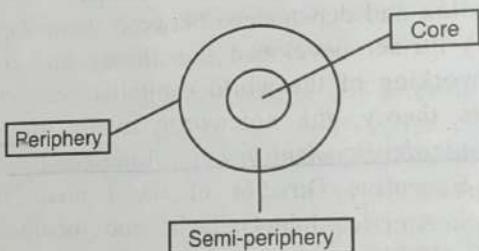


Figure 2.1 Configuration of the modern world system.

in activities like banking, manufacturing, technologically advanced agriculture, ship building and others. The 'periphery' has been providing raw materials such as minerals and timber to support the core's economic expansion. Unskilled labour is repressed and the peripheral countries are denied advanced technology from the core countries in those sectors where they may give the core countries a tough competition. The semi-periphery is involved in a mix of production activities, some associated with core areas and others with peripheral areas. It also serves as an outlet for investment when wages in core economies become too high. Over the time, particular regions of the world may gravitate between core, peripheral and semi-peripheral status. Class structure in each zone varies depending on how the dominant class relates to the world economy.

(৩) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদারনীতিবাদী প্রস্তাবকে বাস্তববাদী তাত্ত্বিকরা আকাশ-কুসূম কলনা বলে সমালোচনা করেছেন। কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বকে যে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না, তার প্রচারণ হিসাবে জাতিসংঘের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যায়।

(৪) সমালোচকরা উদারনীতিবাদের অবাধ-বাণিজ্য নীতির সমালোচনা করেছেন। কারণ অবাধ-বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রক্ষেপের দরকার হয়।

(৫) উদারনীতিবাদের বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতির সমালোচনা করে বলা হয়। যে বিশ্বের বহু অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল নয়।

পরিশেষে বলা যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা পরিলক্ষিত হলে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার কারণে রাষ্ট্রসংঘ অনেক বেশি ঐক্যবন্ধ হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়াও রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবন্ধ হয়ে সুসংহত গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। ফলে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনাও কমেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যে পরিবেশ সৃষ্টির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন ২.৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় নির্ভরশীলতা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ উচ্চাটনের প্রশ্নে ‘নির্ভরশীলতা তত্ত্ব’ আবির্ভাব ঘটে। এই তত্ত্বটি ১৯৬০-এর দশকে লাটিন আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী মহলেও তত্ত্বটি খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৭৯ সালে ফার্নান্দো কারদোসা ও এনজো ফেলেটোর লেখার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বটি বিকাশ লাভ করতে থাকে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব হল সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি ধারণা যে, “পেরিফেরি বা দূরের” দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলো থেকে সম্পদ কোর বা কেন্দ্রের সম্পদশালী ও উন্নত দেশে প্রবাহিত হয়, ফলে ধনী দেশগুলি আরো উন্নত হয়, দরিদ্র দেশগুলি আরো দরিদ্র হয়। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূল যুক্তি হল দরিদ্র দেশগুলির বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার ধরনের কারণেই দরিদ্র দেশগুলি আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনী দেশগুলি আরো সমৃদ্ধশালী হচ্ছে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রায় সকল তাত্ত্বিকই সামাজিকবাদকেই উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য দায়ী করেছেন। এই সকল তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন, আবার কেউ কেউ অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন। আন্তে গুন্দার

ফ্রাংকের "The Development of Underdevelopment" নামক প্রবন্ধে বলেন, উন্নয়ন সংগঠিত হয় কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। তিনি বাজিলের অনুময়নের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

প্রথমত, বিশ্বের মূল উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক (অনুন্নত) দেশগুলির সম্পর্কের ফলে মূল কেন্দ্রগুলি ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে, আর প্রান্তিক দেশগুলি অনুন্নত হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের সাথে প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক যখন সবচেয়ে দুর্বল হয়, তখনই প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায়।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থাকার ফলে যেসব অঞ্চলগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক ও অনুন্নত বলে মনে হয়, সেইসব অঞ্চল আসলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন প্রেরণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল।

চতুর্থত, অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে যে বিশেষ ভূ-সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছিল—যেগুলিকে 'বিরাট জমিদার' বলে উল্লেখ করা হয়—সেগুলির মূল উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য বাণিজ্যিক উদ্যোগে কাজ করা।

পঞ্চমত, সামন্ততান্ত্রিক ও অনুন্নত চরিত্রের পশ্চাতে রয়েছে বিশ্বে প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস।

প্রকৃতপক্ষে ফ্রাংক উন্নত দেশ থেকে প্রান্তিক রাষ্ট্র পর্যন্ত এক শৃঙ্খলকে উল্লেখ করেছেন—যে শৃঙ্খলটি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অঞ্চল থেকে অনুন্নত দেশের প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত ব্যবসায়ী শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত। এই গ্রামীণ ব্যবসায়ী শ্রেণী যেমন তার দেশের উন্নত অঞ্চলের স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনই তিনিও তার গ্রামের কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে প্রান্তিক দেশগুলির অনুন্নয়ন থেকেই যায়। কেননা, নিজস্ব উদ্ভিদকে ব্যবহার করতে না পারার জন্য এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা, মেরুকরণ ও শোষণজনিত বিরোধিতাকে বজায় রাখার জন্য প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফ্রাংক-এর মতে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য দায়ী আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিময়তা। অনুন্নত দেশের বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কই হল অর্থনৈতিক অনুন্নয় ও দুর্বল রাষ্ট্র গঠনের জন্য দায়ী।

অপরদিকে নির্ভরশীলতার তত্ত্বের আর এক তাত্ত্বিক প্রেবিশ-এর মতে প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়, তা উন্নত রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী মডেলের অনুকরণ করা সঠিক নয়। কেননা প্রযুক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও আদর্শসমূহের ওপর উন্নত দেশগুলির একাধিপত্য থাকার জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বিলম্বিত হয়। এর পাশাপাশি, প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় যেখানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত গোষ্ঠীগুলো উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণে

রাখে ও পুঁজিবাদের সুফলগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে দেয় না। মূল পুঁজীভবন বা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এই দুই-এর কোনটিই অনুমত দেশগুলিতে উপর জন্য কখনোই ব্যবহার করা হয় না। প্রেবিশ নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে এক সম্পর্ক বলে মনে করেছেন যেখানে প্রাণিক রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য প্রেবিশের মতে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের এই চাপের ফলে প্রাণিক রাষ্ট্র কী করবে না না সে সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রেবিশ এই সমস্যার সমাখ্যেছেন রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্যে দিয়ে। শুল্ক সংরক্ষণ, আবাস বিকল্প শিল্পায়ন ব্যবস্থা ও সরকারি ভর্তুকি প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাণিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে চলবে এবং আধিপত্যকারী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্বে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে।

প্রশ্ন ২.৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চায় বিশ্বব্যবস্থাপনা তত্ত্ব পর্যালোচনা করো।
অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চায় বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব আলোচনা করো।

উত্তর। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চায় একটি অন্যতম তত্ত্ব হল বিশ্ব ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশ্বব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্বের বৌদ্ধিক মূল মার্কসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত। লেনিনের সামাজ্যবাদ বিষয়ে মতবাদ এই তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। নির্ভরশীলতার তত্ত্ব দ্বারাও বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব প্রভাবিত হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানী ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন। তিনি খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৪, ১৯৮০ এবং ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতি কীভাবে পারম্পরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়।

● **বিশ্ব ব্যবস্থাপক তত্ত্বের মূল বক্তব্য :** বিশ্ব ব্যবস্থাপক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান বক্তব্য এই যে, যোড়শ শতকে উদ্ভৃত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বিশ্বঅর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরা অধিক সঞ্চয়-এর দিকে নজর দিতে থাকে, বৃদ্ধি পায় উদ্ভৃত মূল্য। ফলে শুরু হয় শোষণ। উদ্ভৃত পুঁজিকে দেশীয় সীমানার বাইরে বিস্তৃত করার জন্য পুঁজিপতিরা সচেষ্ট হতে থাকে। পুঁজিবাদী দেশগুলি দুর্বল ও প্রত্যন্ত অঞ্জনে বিনিয়োগ করে বাজার দখল করে সে দেশকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শুরু করতে থাকে। এই সময় থেকে পৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ওয়ালাস্টাইনের ভাষায় পুঁজিবাদ ও বিশ্ব অর্থনীতি একই মুদ্রার দুই দিক। সুতরাং ওয়ালাস্টাইন মনে করেন যে, জাতি-রাষ্ট্র, বিমূর্ত সমাজ বা উন্নয়নের স্তর প্রভৃতির ভিত্তিতে যথার্থভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। প্রতিটি সমাজ বা রাষ্ট্র বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ওয়ালাস্টাইনের মতে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বলতে বোায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে
একটি মাত্র একক বর্তমান—যার মূল বৈশিষ্ট্যই হল একটি মাত্র শ্রমবিভাজন এবং একাধিক
সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। ওয়ালাস্টাইন মূলত দুটি বিশ্বব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন—একটিকে
তিনি বলেছেন ‘বিশ্ব সাম্রাজ্য’ যার মুখ্য উদাহরণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন চিন, মিশ্র
বা রোমের প্রাক-আধুনিক সভ্যতাসমূহকে। অপরদিকে তিনি, বিশ্ব-অর্থনৈতিসমূহকে চিহ্নিত
করেছেন—আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে। এই বিশ্ব
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল—বিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ।

প্রসঙ্গত আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ‘আধুনিক’ বলতে বোঝানো হয় মূলত পুজিবাদী ব্যবস্থাকে। আর ‘বিশ্ব’ বলতে সমগ্র দুনিয়াকে বোঝানো হয় নি—‘বিশ্ব’ বলতে বোঝানো হয়েছে, কাঠামোগত সমগ্র এবং একমাত্র আলোচনার স্তর। ওয়ালারাস্টইন সমগ্র পৃথিবীকে বিভিন্ন এককের মধ্যে একাধিক একক হিসেবে না দেখে, একটি মাত্র একক হিসেবে দেখেছিলেন। আর এই বিশ্ব ব্যবস্থার বিবর্তন ও মিথস্ক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ, এই বিশ্ব ব্যবস্থাপক তত্ত্ব অনুসারে, এই বিশ্বকে বুঝতে হবে একটি ‘ব্যবস্থা’ হিসেবে যেখানে এই ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ একটি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং কয়েকটি অর্থনৈতিক সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার এই পারম্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক একদিকে যেমন শ্রমবিভাজন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি, এই সম্পর্কের একটি ভৌগোলিক ব্যাপ্তিও রয়েছে।

খনিজ পণ্য শিল্পেমত রাষ্ট্রগুলিতে সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন প্রান্তিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। যেমন—উগান্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক এই দুই-এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি। আধা প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলোর মতো অতি উন্নত নয়, আবার প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোর মতো কৃষি বা কাঁচামাল নির্ভর নয়। এই অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা শোষিত হলেও প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ করার সুযোগ পায়। ভারত, বাজিল, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ আর্থিক বিচারে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্র।

স্ব-নির্ভর অর্থনীতি যেহেতু প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির নেই, সেহেতু তাদের আর্থিক অগ্রগতি অসম্ভব। তাই প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি নিজেরাই ডেকে আনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে। বিশ্ব মূলত দু'ভাগে বিভক্ত—প্রভুত্বকারী রাষ্ট্র এবং শোষিত রাষ্ট্র। নয়া-উপনিবেশবাদের নতুন রূপ হল বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের ফলে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্রুত হচ্ছে। আর্থিক, প্রাযুক্তিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করছে ধনী রাষ্ট্রগুলি আর প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি কাঠামোগত সামঞ্জস্য রক্ষা করার পাশাপাশি ভোগবাদী সংস্কৃতি গ্রহণ করে বিশ্বায়নকে জড়িয়ে ধরেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিও যৌথভাবে সমগ্র বিশ্বকে ঘিরে ফেলেছে বাজার অর্থনীতি ও বিকল্প কর্মসংস্থানের মোড়কে।

আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ হয়ে মূল এলাকার রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ও কর্মসূচিকে আটকানোর চেষ্টা করে। কতগুলো আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্র এই কাজে অগ্রসর হয়েছে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, জাতীয় নেতৃত্বের দায়বদ্ধ প্রগতিশীল ভূমিকা এবং শিল্পের অগ্রসরতার মধ্য দিয়ে। তবে আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি যেহেতু কিছুটা কেন্দ্রীয় অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মতো, তাই প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে এরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসেবে।

ওয়ালারাস্টাইনের মতে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিকাশের মূল কারণই হল উন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। তিনি তাঁর তত্ত্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতিকে পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পুঁজিবাদ এক বিস্তৃত ব্যবস্থা বা বিশ্বায়িত প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নয় রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমানাসমূহ পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। এটি রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। বিশ্ব ব্যবস্থার কাঠামো বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ তৈরি করেছে। যেমন—আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা, শ্রেণী, জাতি, বর্গ প্রভৃতি। ওয়ালারাস্টাইন মনে করেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বারা বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটেনি। বিশ্বঅর্থনীতির কাঠামোটি সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

ওয়ালারাস্টাইন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে কতগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, এগুলি

হল—

(১) পূজিবাদী বিকাশের পদ্ধতি সমাজে বিভাজনের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশম্য বৃদ্ধি করে। তার ফলে দরিদ্র দেশ থেকে ধর্মীদেশে জনগণের অনুপবেশ হয়। ঐ ধরনের ব্যাপক উদ্বাস্তু সমস্যা বহু সামাজিক সমস্যার সূচনা করে।

(২) বর্তমান পূজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা বৈষম্যমূলক মজুরী ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ-মূলাফা লাভের সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থার প্রভাবে দরিদ্র ও প্রাণিক মানুষের সংখ্যা সব শহরেই বৃদ্ধি পায়। তার জন্য নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

(৩) পূজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় উদার-বিকাশের প্রহেলিকা থাকে।

(৪) পূজিবাদী ব্যবস্থা-বিরোধী পুরোনো আন্দোলনসমূহের প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পায়। যেমন—জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলন। ফলে এইসব আন্দোলনের পতন ঘটে।

সমালোচনা : বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্বের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাগুলি হল—

প্রথমত, বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্বটির অন্যতম ত্রুটি হল, এই তত্ত্বটি একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের সমস্যাকে দেখানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সেই উন্নয়নের স্তর বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বা ততোধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু এই স্তরবিন্যাসের তত্ত্ব নির্মাণের পথে বিশ্বব্যবস্থা একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীগঠন বা শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক সম্পর্ককে বা আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণীবিন্যাসের প্রকৃত স্বরূপের আলোচনাকে নিজ তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্গত করেনি।

দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে বিশ্ব ব্যবস্থাপক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ কেবলমাত্র অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন, তা ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও প্রভাব বর্তমান তার গুরুত্ব ও শক্তি পরিমাপ করতে পারেনি এই তত্ত্ব।

তৃতীয়ত, পূজিবাদী বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধ দেশেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই সকল দেশের সংগঠিত প্রতিরোধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কী তাৎপর্য বহন করে সেকথা এ তত্ত্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়নি।

চতুর্থত, এই তত্ত্বের সাহায্যে প্রাণিক অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পঞ্চমত, বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্বে আধা-প্রাণিক রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি।

ষষ্ঠত, সমালোচকদের মতে, বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব বিশ্বের পরিবর্তন ও কাঠামোগত রূপান্তর বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেনি।

সপ্তমত, সমালোচকদের মতে এই তত্ত্বের প্রবক্তরা বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও-এর বিকল্প দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ওয়ালারাস্টাইনের বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা থাকলেও একটা অনন্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের বিকাশের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করেছে।